The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা : একটি পর্যালোচনা

[Justice and Accountability in the View of Islam: An Overview]

Dr. Muhammad Rafiqul Islam-1
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 22 January 2025
Received in revised: 29 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Justice, Accountability, Islam

ABSTRACT

Justice and accountability are the key elements in establishing peace and security in society and the state. Allah has given various instructions to establish this justice and accountability. However, it is clear that injustice begin from nepotism and corruption. And when injustice, oppression and torture are carried out by people in the upper class of society, it is also transmitted to the subordinates. And gradually the society becomes corrupt and becomes unfit for human life. For this reason, Allah Ta`ala and His Prophet (sm.) have gaven so much importance to establishing justice and accountability that even the enemy should not be deprived of justice. In this regard, a directive of the Prophet (sm.) is applicable. As it is narrated, "O mankind! Indeed, those before you went astray because if a respected person among them stole, they would let him go. And when a weak person stole, they would punish him. By Allah! If Fatima, the daughter of Muhammad (sm.) have to steal, Muhammad (sm.) would certainly cut off her hand." On the other hand, accountability is also one of the fundamental aspects of Islam. Realizing its necessity in human society, the Prophet (sm.) said, "Beware! Each of you is responsible and each of you will be questioned about his responsibilities." From this incident and Hadith of the Prophet (sm.), the importance of justice and accountability in Islam is clearly evident. However, justice and accountability are not concerned to lawsuits only. Rather, there is a matter of justice and balance in human behavior as well. With this, the standard of justice will be established in all areas of human beliefs, words and deeds, nature and character, transactions and emotions. If Islamic laws and penal codes can be implemented even in the present age, then all injustice, nepotism and corruption can be eliminated from society and an ideal society can be established.

ভূমিকা

ইসলামে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে ন্যায়বিচারের অভাব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বড় ধরনের অপরাধ করার পরও অপরাধী কোন না কোন ভাবে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে অপরাধীকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে একটি মহল। অথচ আল-কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যদি নিজ পিতা-মাতার বিরুদ্ধেও রায় প্রদান করতে হয়, তাহলেও তা করতে হবে। আর বর্তমানে হচ্ছে ঠিক তার উল্টা, অপরাধী যদি নিজের আত্মীয়-স্বজন হয় তাহলে তাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই চেষ্টায় অনেকেই নিয়োজিত থাকে। আজ যারা সমাজ ও দেশে নানা প্রকার অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে, তারা তো কোন না কোন পরিবারেরই সদস্য। অপরাধীদের পরিবার যদি প্রথমেই সোচ্চার হত, তাহলে অপরাধের মাত্রা এমনিতেই অনেক কমে যেত কিন্তু আমরা তা করছি না। তাই বর্তমানে ন্যায় বিচারের বড়ই অভাব, আর একারণেই বিশ্বজুড়ে অশান্তি, রক্তপাত, মারামারি, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক অস্থিরতা আর অরাজকতা বিরাজ করছে। এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক ও শাসনকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ সচেতন হলেই সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। মুলত: আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় ন্যায়বিচারক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই ভূষণ। তাই শাসনকার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করছেন যে, তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এভাবে ন্যায়পরায়ণতা ও জবাবদিহিতার নিরিখে যদি শাসন ও বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়,

তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বিষয়টি অতীবও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আলোচ্য অংশে ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

আভিধানিক দৃষ্টিকোণে ন্যায়বিচার

ন্যায়বিচার শব্দে দু'টি দিক রয়েছে, একটি হচ্ছে ন্যায় বা সঠিক আর অন্যটি হচ্ছে বিচার। তাই এ দু'টি দিকের সমন্বয়েই গঠিত শব্দই ন্যায়বিচার। তবে ন্যায় শব্দটির অর্থ হচ্ছে যুক্তি, নীতি, সুবিচার, সততা, বি. (ন্যায়সম্মত, ন্যায়বিরূদ্ধ, ন্যায়বিচার ও ন্যায়নিষ্ঠ), অব্য, তুল্য, সদৃশ ও মতো ইত্যাদি। যেমনঃ ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ। অর্থাৎ 'ন্যায় বা বিধি মেনে চলে এমন'।[১]

মূলতঃ কোন বিষয় বা কোন কিছুকে তার যথার্য ও সঠিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাকেই ন্যায়বিচার বলে। এ দৃষ্টিকোণে ন্যায়বিচারের কমপক্ষে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। যথা: প্রথমতঃ কোন ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী যথার্থ পদ বা কোন কার্যে নিয়েজিত করা। দ্বিতীয়তঃ অপরাধীকে বিচার ও দণ্ডাদেশের সন্মুখীন করা বা পরিস্থিতির যথার্থ গুরুত্ব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তৃতীয়তঃ সম্পদ ও সম্পত্তি তার উপযুক্ত ও যথার্থ দাবীদারকে বুঝে দেওয়া। ইসলামে ন্যায়বিচার মুলতঃ একটি সম্পূরক ধারণা, যা কোন বর্ণ, গোত্র বা সম্প্রদায়ের অনুকূলে ফায়সালা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ইসলামে ন্যায়বিচারের ধারণা ব্যাপক ও বিস্তৃত। এটি কোন পরিসর বা পরিসীমা ছাড়াই ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর মানবজাতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে।[২]

সংজ্ঞা: ন্যায়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, ন্যায় হলো একপ্রকার আদর্শমূলক তত্ত্ব; তাই ন্যায়ের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করা একটি জটিল বিষয়। ন্যায়বিচার মূলতঃ একটি নৈতিক ধারণা। এর মূল ভিত্তি হলো যৌক্তিকতা, যথার্থতা ও ঔচিত্যমূলক বিষয়। তবে দেশ-কালভেদে ন্যায়ের ধারণার পরিবর্তন ঘটে থাকে। তাই বলা যায় যে, ন্যায় হলো একটি গতিশীল ধারণা। সময়ের সাথে সাথে মানুষ ও সমাজের আদর্শ, রীতিনীতি, প্রথা ও সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেহেতু ন্যায়ের ধারণাটি উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত, তাই ন্যায়েরও পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।[৩] এ সম্পর্কে অধ্যাপক বার্কার বলেন, "ন্যায় হলো সম্পূর্ণরূপে মূল্যবোধের সমষ্টি এবং ন্যায়ের মধ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলোর সমাবেশ ঘটে থাকে। আর ন্যায় শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Justice এবং এ শব্দটি এসেছে দু'টি ল্যাটিন শব্দ Justus ও Justitia থেকে। যার অর্থ হচ্ছে, সংযোগসাধন ও সমন্বয়সাধন। সুতরাং একটি সুগঠিত ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন মূল্যবোধের সমন্বয় হলো ন্যায়।[৪]

ন্যাবিচার শব্দের অন্য অংশটি হলো বিচার। আর আরবী ভাষায় বিচারের প্রতিশব্দ হলো لقضاء।, যার আভিধানিক অর্থ বিবদমান দু' পক্ষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া।[৫] কারও কারও মতে বিচার (لقضاء।) শব্দটির অর্থ মীমাংসা করা, চাই তা বাচনিক হোক বা আচরিক।[৬] অন্যদিকে অনেকে বিচার (لقضاء।) এর অর্থ বলেছেন, ফায়সালা বা রায় প্রদান করা। তবে একে আল-হুকম (الحكم।)ও বলা হয়ে থাকে।[৭]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

বিচার (لقضاء।)-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. ইমাম জুহরী বলেন, لقضاء إمضاء الحكم । অর্থাৎ 'আইন কার্যকর করাকে বিচার বলে।[৮]

২. 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী বলেন, لقضاء هو الحكم بين الناس بالحق । 'মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা করাকে বিচার বলে।'[৯] ইবন আবিদীন বলেন, أنّ المراد بالقضاء الحكم 'বিচার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফায়সালা করা।'[১০]

৩. মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ বলেন, শরী'আহর কোন বিধানকে অবশ্য পালনীয় নির্দেশ আকারে প্রকাশ করাকে বিচার বলে।[১১]

সুতরাং বিচার হলো, কোন রাষ্ট্রের বিচারালয়ে বিচারকের নিকট উপস্থাপিত বাদী-বিবাদীর যে কোন বিবাদ মিমাংসার জন্য আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমার শুনানি, সাক্ষ্য, তদন্ত ও প্রমাণ সাপেক্ষে যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রায় প্রদান করাকে বিচার বলে।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা: ইসলামী বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যাপকার্থে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র কর্তক অনুমোদিত ও সুনির্ধারিত নীতিমালার আলোকে গঠিত যে বিচারব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী বিচারব্যবস্থা (Islamic Judicial System) বলা হয়। বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. মদীনা মুনাওয়ারাহ রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামী বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: ইসলামী বিচারব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো দু'টিঃ যথাঃ **১.** আল্লাহ তা'আলার আইন প্রতিষ্ঠা করা, ২. ন্যাবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ইসলামী বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এ প্রসঙ্গে প্রমাণ হচ্ছে, যথা:

ক.**আল-কুরআন**

১. এ ব্যাপারে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

'যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফির।'[১২]

২. অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা ফায়সালা করে না, তারা যালিম।'[১৩]

৩. অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা ফায়সালা করে না, তারা ফাসিক।'[১৪]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ প্রসঙ্গে তাফসীরে বাগাভীতে বর্ণিত হয়েছে, ﴿والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين﴾

'আর যালিম ও ফাসিক এরা সরাই কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত।'[১৫]

খ. আস-সুন্নাহ

১.ইসলামী বিচার ব্যবস্থার শারয়ী' মর্যাদা এবং কার্যকর করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ»

'উবাদা ইবন সাবিত রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহর হদ্দ (দণ্ডবিধি) কার্যকর করবে, চাই সে নিকটবর্তী আত্মীয় হোক বা দূরবর্তী। আল্লাহর কাজে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনা যেন তোমাদেরকে বিব্রত না করে।'[১৬]

২. এ সম্পর্কে হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ "

'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, যে (মুসলিম) ব্যক্তি আল-কুরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করে (মুরতাদ হওয়ার কারণে) তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া জায়িয। আর যে বলে-আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ তার বান্দা ও রাসূল; তার উপর কারও কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। কিন্তু সে যদি শাস্তিযোগ্য কোন কাজ (হদ্দের অপরাধ) করে, তবে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।'[১৭]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সবার জন্য সকল ক্ষেত্রে ন্যাবিচার প্রতিষ্ঠা করবে। এটাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার অন্যতম ও প্রধান দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার হকদারদের নিকট প্রত্যর্পণ করবে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।'[১৮]

উল্লেখিত আয়াতে الْعَدْلِ এর অর্থ ইনসাফ বা ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করা। সুতরাং এখানে বর্ণিত আয়াতের দাবী হচ্ছে জীবনের সব ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[১৯] এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

'মুমিনদের দু'টি দল বিবাদে লিপ্ত হলে, তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরূদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরূদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।'[২০]

ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ ইহসান ও ন্যায়বিচারের নির্দেশ প্রদান করেন।'[২১] এ সম্পর্কে তাফসীরে জালালাইনে الْعَدْلِ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, التوحيد أو الإنصاف আল্লাহ তা'আলা 'তাওহীদ' অথবা 'ইনসাফ' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করেছেন।[২২]

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সাম্য, দূর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আল-কুরআনে ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

'তবে কি তারা জাহিলি যুগের বিধি-বিধানের ফায়সালা কামনা করে ? আর এ কথা নিশ্চিত যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে (হুকম) বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিক শ্রেষ্ঠতর।'[২৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবি'য়ী মুজাহিদ রহ. বলেন যে, এখানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইয়াহুদীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২৪] আর এ বিচারব্যবস্থা পরিচালনার মূলনীতি হবে একমাত্র ওহী ভিত্তিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ 'আর তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফায়সালা করেন এবং আল্লাহই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।'[২৫] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং তাঁর প্রদত্ত বিচার ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম বিচার ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে বিষয়টি তা হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ইনসাফ ও ন্যাবিচার হলো শান্তির চাবিকাঠি। সরকার ও জনগণ উভয়ের উপর রয়েছে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। এমনকি পারিবারিক জীবনেও যদি ইনসাফ না থাকে, তাহলে সেখানেও অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। আজকের বিশ্বে হিংসা ও হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইনসাফ ও ন্যায়বিচার না থাকা। তাই বলা যায়, No Justice no peace. 'ন্যায়বিচার নেই তো শান্তি নেই।' গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দল সোচ্চার থাকায় সেখানে সবসময় উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করে। এ কারণেই সে সমাজে সবসময় সঠিক অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। ফলে নিরপরাধ মানুষ অধিকার বঞ্চিত হয়ে নির্যাতিত হয়। মানুষ হক কথা বলতে ভয় পায়। সম্মানিত ব্যক্তি অসম্মানিত হয়। বর্তমানে গণতান্ত্রিক দেশসমূহে যে চরম পন্থার উদ্ভব ঘটেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ক্ষমতাসীনদের অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতা। অন্যদিকে ন্যায় ও সুবিচার হলো শান্তি ও সুখের চাবিকাঠি। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষ আজ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছে। মহাসাগরে ডুব দিয়ে মুক্তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু নিজ গৃহাভ্যন্তরে এক ফোটা সুখের প্রলেপ সে খুঁজে পায় না। পরস্পরে বিশ্বাস ও ন্যায়বিচার থাকলে কুঁড়ে ঘরেও শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু তা না থাকলে সুউচ্চ বালাখানাও অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী বিশ্বব্যবস্থা মানুষকে বিলাস সামগ্রী উপহার দিয়েছে। কিন্তু তা মানুষকে শান্তি ও সুখ দিতে পারেনি। কারণ বর্তমানে সর্বত্র অন্যায় ও বে-ইনসাফীর অবাধ বিচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর চতুর্দিকে বিরাজ করছে ধর্মহীনতার উন্মত্ত সয়লাব।

তাই সমাজে বসবাসকারী সকলের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য মানুষের মাঝে সংঘটিত পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মিমাংসার লক্ষ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মহৎ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা এ কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার উপরই নির্ভর করে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্তরিকতা, সৌহাদ্য ও সম্প্রতি এবং তার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখা। মুলতঃ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। সে কারণেই এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক ও অনস্বীকার্য। মানুষের মাঝে শুধু বিচার করা নয় বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অত্যধিক প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে।

ন্যায়বিচার মুসলমানদের কাছে ঈমান আনয়নের পর অবশ্য পালনীয় ফরযসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম ফরয। কেননা আসমান ও যমীন সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে টিকে আছে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে একজন ন্যায়বিচারেক হিসাবে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন,

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

'আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের মধ্যে আল্লহ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করবে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। তবে তাদের ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কিছু বিধানের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না ফেলে।'[২৬]

ইতিহাসে কোন কোন জাতির শ্রেষ্ঠ অবদান ও কীর্তিময়তার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) কে লক্ষ্য করে ন্যাবিচারের ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন। আল-কুরআনে এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে,

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾

'হে দাউদ, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার করবে। এ ব্যাপারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না। তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি ; এ কারণে যে তারা বিচার দিবসকে ভূলে গেছে।'[২৭]

ন্যায়বিচারের পরিধি ও বাস্তবতা

ন্যায়বিচারের অন্যতম দিক হলো ন্যায়নীতি ও সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকা। আর সাক্ষ্যের অপর দিক হলো সুপারিশ করা। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য ও সুপারিশ করলে তার পরকালীন প্রতিদানও অত্যধিক। আর বিপরীত কিছু ঘটলে তার মন্দ পরিণতিও ভয়ংকর। যেমন এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾

'যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে, সে তার নেকী পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ বা খারাপ কাজের সুপারিশ করবে সে তার অংশ পাবে।'[২৮]

উক্ত আয়াতটি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর প্রদান, আইনজীবীদের বাদী-বিবাদী পক্ষ সমর্থন, নেতৃত্ব নির্বাচন সবই উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত। যদি কেউ জেনে-বোঝে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় নম্বর প্রদান করে এবং কোন আইনজীবী যদি শুধুমাত্র পেশার কারণে জেনে-শুনে মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে, তবে সে ব্যক্তি নি:সন্দেহে কবীরা গুনাহ করার কারণে গোনাহগার হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি জেনে-শুনে অযোগ্য নেতা নির্বাচনে সমর্থন দেয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐ নেতার যাবতীয় দুষ্কর্মের অংশীদার হিসেবে গণ্য হবে। আর আদালতে সাক্ষ্যদানের ফলাফল সীমিত সংখ্যক লোকের উপর বর্তায়। কিন্তু নেতা নির্বাচনে সাক্ষ্য বা সমর্থন দানের তিনটি দিক রয়েছে। যথা: ১. সাক্ষ্য দান করা ২. ব্যক্তিগত সুপারিশ করা ৩. সামষ্টিক অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে নেতা হলেন সমষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতাকে সমর্থন দিলে নেতার যাবতীয় নেকীর কাজের ছাওয়াবের একটা অংশ যেমন সমর্থনকারী পাবে, তেমনি বিপরীত কিছু ঘটলে তার মারাত্মক ফলাফলও সমর্থনকারীর আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। কারণ নেতার সঠিক বা ভূল সিদ্ধান্তের ফলাফল সমাজের সকল লোকের উপর আপতিত হয়। সে কারণে ইসলামে নেতৃত্ব গ্রহণ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং লোকদের নিকট কর্তৃত্ব চাওয়াকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে চাওয়া বা আকাংখা ব্যতীত আল্লাহর পক্ষ হতে পূর্বতন নেতার মাধ্যমে বা জনগণের মাধ্যমে যদি নেতৃত্ব এসে যায়, তবে তার যথাযথ হক আদায়ের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চাওয়া ব্যতীত প্রাপ্তিতে আল্লাহ তা'আলা বরকত দেন, আর চেয়ে নিলে তাতে আল্লাহ তা'আলার রহমত চলে যায়। এক্ষেত্রে আধুনিক গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি সমাজকে যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে দলীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে এমন নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, মানুষ তাকিয়ে আছে কখন নিরপেক্ষ ও আদর্শ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে। অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা এবং সন্দেহভাজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে 'হাজত' এর নামে কারাবন্দী করে রাখার ও নির্যাতন করার যে জঘন্য ও নোংরা দৃষ্টান্ত এ দেশে চালু হয়েছে, তার বিপরীতে ইসলামের সহজ-সরল প্রত্যক্ষ বিচার পদ্ধতি কতই না যুক্তিযুক্ত ও সার্বজনীন। [২৯]

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যাকেই তাদের বিরোধী ভাবত, তাকেই হাজতের নামে বছরের পর বছর কারাবন্দী করে রাখত এবং ইচ্ছামত নির্যাতন করত। যাতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আজ স্বাধীন দেশের জনগণের সরকার নিজ দেশের জনগণকেই শত্রু ভেবে তাদের উপর সেই বৃটিশ আইনের বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ৫৪ ধারা নামক যুলুমের ধারাটিকে প্রত্যেক দলীয় সরকার তার সম্ভাব্য বিরোধীদের দমন-পীড়নে ব্যবহার করছে, যা নি:সন্দেহে মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বর্তমানে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে অন্যদের তদন্তাধীন বিভিন্ন মামলায় টার্গেটকৃত ব্যক্তির নাম সংযুক্ত করে বিচারের নামে কারাবন্দী রেখে নির্যাতন করার নতুন ধারা শুরু হয়েছে, যা আরও মর্মান্তিক। বছরের পর বছর হাজত খেটে যখন কোন ব্যক্তি 'বেকসুর খালাস' পেয়ে বেরিয়ে আসে, তখন তার হারানো জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার কোন পথ আর থাকে না। এজন্য জনগণের নির্বাচিত সরকার সামান্য 'দু:খ' পর্যন্ত প্রকাশ করে না। এভাবেই মযলুম মানবতার দীর্ঘশ্বাসে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস ভারি হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ ও দলীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে কখনই সত্যিকারের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কারণ বস্তুবাদী দলীয় সরকারের অধীনে রাষ্ট্রযন্ত্র ও

সমাজদেহের সর্বত্র দলীয় লেজুড়বৃত্তির ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে। যা পুরো সমাজকে বিষাক্ত ও জর্জরিত করে দিচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষা ও প্রশাসন দু'টি প্রধান ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দলান্ধতার বিষবাষ্পে সর্বত্র সততা ও মেধার সঙ্কট দেখা দেওয়ায় জাতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। অথচ দলের নেতারা একবারও ভাবেন না যে, এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা সাময়িক লাভবান হলেও দেশ ও জাতির স্থায়ী ক্ষতি করে যাচ্ছেন।[৩০]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পন্থা

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব: ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম পন্থা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মানব সমাজে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাকওয়া বা খোদাভীতি। তবে এর অর্থ কেবল মনে মনে আল্লাহকে ভয় করা নয়, বরং তার অর্থ হলো আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। আবূ জাহলসহ জাহেলী আরবের **১৫**জন নেতা একত্রে বসে একদিন রাসূল সা. কে তার দা'ওয়াত পরিত্যাগের বিনিময়ে আরবের নেতৃত্ব, অঢেল ধন-সম্পদ ইত্যাদি দেওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব দিল। জবাবে রাসূল সা. বললেন, এতকিছু না করে তোমরা যদি কেবল একটা কলেমা পড়, তাহলেই আরব-আজমের নেতৃত্ব ও অঢেল ধন-সম্পদ তোমাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে। আবূ জাহল খুশিতে বলে উঠল, এমন হলে একটা কেন দশটা কলেমাও পড়তে রাজি আছি। রাসূল সা. বললেন, তোমরা পড়, "লা ইলাহা ইল্লাললাহ"। তখন আবূ জাহল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, সব ইলাহ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র একজন ইলাহ; এত বড় বিস্ময়কর কথা। যা আল-কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾

'সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কোন কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়।'[৩১]

আবূ জাহল গোপনে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করত এবং মানত। তা সত্বেও সে কলেমা পাঠ করেনি। কারণ সে এর গুঢ় তত্ত্ব বুঝত যে, একক আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করলে তাঁর বিধান মেনে চলতে হয় এবং নিজেদের মনগড়া আইন যা দিয়ে মানুষকে গোলাম বানানো যায়, শোষণ করা যায়, তা আর চালানো যাবে না। বস্তুত: আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল মানবাধিকার নিশ্চিত হয় এবং মানব সমাজে সত্যিকারের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

'ইবাদাত ও একত্ববাদের অনুশীলন: যুগে যুগে নবীগণ আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত ও একত্ববাদের দা'ওয়াত দিয়েছেন। আর তাদের এ দা'ওয়াত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছিল। অথচ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাগণ কখনই নবীগণের এ দা'ওয়াত মেনে নেয়নি। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।'[৩২]

আল-কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে, ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ﴾ 'নিশ্চয় অমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই।'[৩৩]

নবীগণ শত নির্যাতন সহ্য করেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেননি। বরং হাসিমুখে কারাগার ও শাহাদাত বরণ করেছেন। আর এ আপোষহীনতাই ছিল তাঁদের 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'। যার মধ্যে রয়েছে মযলুম মানবতার সত্যিকারের মুক্তির পথ। আজও প্রকৃত মানব দরদী তিনিই হবেন, যিনি সমস্ত দুনিয়াবী লোভ-লালসার উর্ধে উঠে মানুষকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিবেন এবং এ পথে প্রাপ্ত নির্যাতনকে আর্শিবাদ হিসাবে বরণ করে নিবেন। দুনিয়াতে কিছু না পাওয়ার বিনিময়ে আখিরাতে তার জন্যে অপেক্ষা করছে জান্নাতের ফুলশয্যা। দুনিয়া পূজারী আরবরা যখনই নিজেদের বানোয়াট সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করে আল্লাহর একত্ববাদ ও 'ইবাদাত কবুল করে নিল এবং নিজেদের মনগড়া আইন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করল, তখনই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে গেল। তারপর সেই অন্ধকার সমাজ থেকে বেরিয়ে এলেন -আবূবকর, উমার, 'উসমান, 'আলী, ইবন মাস'উদ, ইবন 'উমার, খালেদ, তারেক, মূছা ইবন নুসাইরের মত বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিবর্গ।[৩৪]

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

কোন সমাজ বা রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা গেলে সেখানে সহজেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কেননা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশিত শাসন ব্যবস্থা। আর আল্লাহ তা'আলা যেহেতু ন্যায়বিচারক, কাজেই তাঁর নির্দেশিত ব্যবস্থায় কখনও অন্যায়, অবিচার হতে পারে না। তাই তো দেখা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সে দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রনায়ক মি. গান্ধী ভারতের নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, যদি তোমরা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তাহলে 'উমরের শাসন ব্যবস্থা কায়েম কর। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ বলেছিলেন, I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that world bring it the much needed peace and happiness. "আমি বিশ্বাস করি যে, যদি তাঁর (মুহাম্মদ সা.) মত একজন মানুষ আজকের আধুনিক বিশ্বের ডিক্টেটর হতেন, তাহলে তিনি একাই বহু আকাংখিত শান্তি ও সুখ এনে দিতে পারতেন।"[৩৫] এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহভীরু ব্যক্তির কাছেই অন্য মানুষের জান, মাল ও ইজ্জত সবকিছু নিরাপদ। যার অভাবে আজকের বিশ্ব সমাজ জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। নফসের পূজারী ব্যক্তি স্বীয় নফসের খায়েশ মিটাতে অন্যের উপর যুলুম করে। কিন্তু আল্লাহভীরু ব্যক্তি নিজের চাহিদার উপর অন্যের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের বাপ-দাদারা গরীব ছিলেন কিন্তু তাদের মনে সুখ ছিল। তারা মন খুলে হাসতেন। উদারমনে মেহমানদরি করতেন। অন্যের সুখ-দু:খের ভাগী হতেন। কিন্তু আজ আমরা 'এসি' ঘরে বসেও সুখ পাইনা। মনের পবিত্রতা হারিয়ে গেছে। সেখানে বাসা বেঁধেছে হিংসা-বিদ্বেষ কুটিলতা ও কৃত্রিমতা। এ অশান্তিময় বিলাসিতার চাইতে শান্তিময় কুঁড়ে ঘর কি উত্তম নয়। আধুনিক কোন তন্ত্র-মন্ত্র কি পেরেছে মানুষকে সেই সুখ দিতে ? এক্ষেত্রে আল্লাহভীরু মানুষই পারে নিজের আরাম-আয়েশকে অন্যের জন্য বিসর্জন দিতে, পারে নিজের উপরে অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে।[৩৬]

ইসলামে জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা শব্দের অর্থ

জবাবদিহিতা শব্দের অর্থ সম্পর্কে 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কৈফিয়ত, দায়িত্ব ইত্যাদি।[37] কারও কারও অভিমতে জবাবদিহিতার আভিধানিক অর্থ হলো কৈফিয়ত। বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে জবাবদিহিতা শব্দটির অর্থে বলা হয়েছে যে, কোন কাজের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ও তৎসংক্রান্ত প্রশ্নাদির জবাবদিহিতে প্রস্তুত থাকা। মোটকথা যখন কোন ব্যক্তি তার কাজের জন্য কারও কাছে উত্তর দেয় যে সে কাজটা কিভাবে করেছে তাকে জবাবদিহিতা বলে। জবাবদিহিতা হচ্ছে সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা। এক কথায় জবাবদিহিতা বলতে বোঝায় দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি ও দায়-দায়িত্বের স্বীকারোক্তি।[৩৮] কেউ কেউ বলেন, জবাবদিহিতা এমন একটি নীতি যার অধীনে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু কর্তব্য পালন করে এবং তাদের কর্তব্য সম্পাদনের হিসাব এমন একটি কর্তৃপক্ষের কাছে দিতে বাধ্য করা যেতে পারে যারা পুরস্কার বা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাখে। তবে জবাবদিহি শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'কম্পিউটেয়ার' থেকে এসেছে, যার অর্থ গণনা করা। জবাবদিহি করার জন্য একজন ব্যক্তিকে তার তত্ত্বাবধানে থাকা সম্পত্তি বা অর্থের গণনা করতে হত। আর্থিক হিসাব রক্ষণ বা বাজেটের রেকর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত সকল ধরনের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার হয়। তবে 'হিসাব প্রদান' অর্থে জবাবদিহি করার আরও আলোচনামূলক অর্থও এই শব্দটির ইতিহাসের প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিল। অতএব একটি বিমূর্ত বিশেষ্য হিসেবে জবাবদিহিতা বলতে হিসাব দাখিলের ক্ষমতা এবং বাধ্যবাধকতা উভয়কেই বোঝায়।[৩৯] রাজনৈতিক বা আইনি আলোচনায় জবাবদিহিতা প্রথমে শিল্পের একটি শব্দ হিসেবে বা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত এবং স্ব স্থায়ী ধারণা হিসাবে বিকশিত হয়নি। রাজনীতি এবং প্রশাসনে, দায়িত্ব ছিল প্রযুক্তিগত শব্দ যা জনসাধারণের কর্তৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে তাদের আচরণ এবং কর্মকাণ্ডে 'প্রতিক্রিয়া' দেওয়ার কর্তব্য নির্দেশ করার জন্য পছন্দ করা হত। আইনে 'দায়বদ্ধতা' শব্দটি এমনভাবে ব্যবহার করা হত (এবং করা হয়) যে, একটি নির্দিষ্ট কাজ (অথবা একটি নির্দিষ্ট চুক্তিতে প্রবেশ) করে একজন ব্যক্তি নিজেকে একটি বাধ্যবাধ্যকতার অধীনে রেখেছেন এবং সেই জন্য সেই কাজ (অথবা চুক্তিতে প্রবেশ) থেকে উদ্ভূত পরিণতির জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয়। সুতরাং অনেক সময় 'জবাবদিহিতা' ইংরেজীতে এমন একটি শব্দ পরিবারের অংশ বোঝায়, যা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, নির্বাহী এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং পরিবারের অংশ ছিল যা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, নির্বাহী এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং আরও সহজভাবে, আইনি দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি আন্ত:সম্পর্কিত অর্থকে অন্তর্ভূক্ত করে।[৪০]

জবাবদিহিতার পারিভাষিক অর্থ

জবাবদিহিতা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজে ও রাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষ ও নাগরিকের চাহিদা বা দাবীর প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের বা কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সিটিজেন চার্টার বা প্রাতিষ্ঠানিক বিধি অনুযায়ী নাগরিক বা সদস্যগণের নিকট যে কোন বিষয় চাহিদামাত্র উপযুক্ত প্রামাণিক তথ্য জানাতে বাধ্য থাকার নাম জবাবদিহিতা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা একে অন্যের পরিপূরক। এক কথায় বলা যায় যে, জবাবদিহিতা হচ্ছে সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধ্যকতা।[৪১]

কেউ কেউ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কাজের জন্য অন্য কারও কাছে কৈফিয়ত দেয় তখন তাকে জবাবদিহিতা বলে। জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জবাবদিহিতা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যে কোন রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা বলতে সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পাশাপাশি নাগরিক সেবা দানকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতাকেও অন্তভূক্ত করে।[৪২]

ইসলামে জবাবদিহিতার গুরুত্ব

মানব জীবনে অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো জবাবদিহিতা অনুভূতির দুর্বলতা। আর এ জবাবদিহিতা মুলতঃ দু' প্রকার: ১. মানুষের নিকট জবাবদিহিতা এবং ২. আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা। মানুষের নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি কমে গেলে বা বিলুপ্ত হলে মানুষ যত না বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তার চেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি বিলুপ্ত হলে। কেননা আল্লাহর নিকটে যমীন ও আসমানের কোন কিছুই গোপন থাকে না। তিনি এমন এক সত্তা যার নিকট মানুষের চোরা চাহনি এবং তাদের অন্তরের গোপন কথাও গোপন থাকে না। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ 'চোখের চাহনি ও অন্তরের গোপন বিষয়ও তিনি জানেন।'[৪৩] যদি প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সজাগ ও সচেতন হত ও আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি তীব্রতর হত, তাহলে সমাজের সিংহভাগ অভিযোগ ও সমস্যা সহজেই বিদূরিত হয়ে যেত।

পৃথিবীর মানুষের মধ্যে মুসলমানগণই হলো মানবতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। কারণ তারা যা কিছুই করে আল্লাহ তা'আলার সন্তষ্টির জন্যে এবং আল্লাহ তা'আলার ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকে। কেননা তারা জানে যে, কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম অতি গোপনে বা নিভৃতে করলে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন থাকে না। বরং আল্লাহ তা'আলা গোপন-প্রকাশ্য সব কিছুই দেখেন ও জানেন এবং কিয়ামতের দিন তারা তা দেখতে পাবে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'[৪৪] আখিরাতে কঠিন শাস্তির ভয়ে সে সদা কম্পবান থাকে। কেননা তারা জানে যে, সেদিন যার ওজনের পাল্কা হালকা হবে' তার ঠিকানা হবে 'হাবিয়াহ'। আর তা হচ্ছে প্রজ্বলিত অগ্নিময় হাবিয়াহ দোজখ। যেমন আল-কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে, ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ 'আর যার ওজনের পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে 'হাবিয়াহ'। আপনি জানেন তা কী ? প্রজ্বলিত অগ্নি।'[৪৫]

বস্তুতঃ কিয়ামতের দিন ওজনের পাল্লা হালকা হওয়ার ভয়েই 'উমার রা. তার খিলাফতকালে বলতে গেলে ঘুমাতেন না। তিনি বলতেন, যদি আমি রাতে ঘুমাই, তাহলে আমি নিজেকে ধ্বংস করলাম। আর যদি দিনে ঘুমাই, তাহলে প্রজাদের ধ্বংস করলাম। কেননা আমি তাদের উপর দায়িত্বশীল।[৪৬] উমাইয়া খলীফা 'উমার ইবন 'আবদুল 'আজীজ (৯৯-১০১ হি.) রাতের বেলা মোটা মোমবাতি জ্বেলে কর্মকর্তাদের ডেকে প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছিলেন। ... এমন সময় একজন বলে উঠল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার নিজের অবস্থা ও পরিবারের অবস্থা কেমন ? তখন খলীফা ফুঁ দিয়ে বড় মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলেন এবং গোলামকে উচ্চঃস্বরে ডেকে বললেন, চেরাগ নিয়ে আসার জন্য। কিছুক্ষণ পর চেরাগ এল, যা নিভূ নিভূ আলোয় জ্বলছিল। এবার তিনি বললেন, তুমি এখন যা খুশী আমাকে প্রশ্ন কর। অত:পর তিনি তার প্রশ্নসমূহের উত্তর দিলেন। শেষে ঐ ব্যক্তি তাঁকে বড় মোমবাতিটি নিভিয়ে দিয়ে নিভূ নিভূ চেরাগ আনার কারণ জিজ্ঞাসা করল। জবাবে খলীফা বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! বড় মোমবাতিটি যা আমি নিভিয়ে দিয়েছি, সেটি ছিল আল্লাহর মাল ও মুসলমানদের মাল। তার আলোয় আমি প্রজাদের অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। কিন্তু যখনই তুমি আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, তখনই আমি মুসলমানদের মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলাম।[৪৭]

জবাবদিহিতার অনুভূতি ও দায়িত্বানুভূতির তীব্রতা মুসলিম নেতাদের মধ্যে কেমন পর্যায়ে ছিল, তা উমার ইবনুল খাত্তাব রা. এর একটি ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। একদিন তিনি প্রচণ্ড সূর্য তাপে সাদাকার উটের পরিচর্যা করছিলেন। এমন সময় বনু তামীরের নেতা আহনাফ ইবন কায়েস ইরাক থেকে একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আসেন। যখন তারা নিকটবর্তী হন, তখন খলীফা 'উমার রা. ডেকে বললেন, হে আহনাফ! কাপড়-চোপড় ছেড়ে দ্রুত এস এবং উট পরিচর্যার ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনকে সাহায্য কর। কেননা এগুলো সাদাকার উট। এর মধ্যে ইয়াতীম-মিসকীন ও বিধবাদের হক্ক রয়েছে। তখন একজন বলল, হে আমিরুল মুমিনীল! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি সাদাকাহ খাতের কোন একজন গোলামকে এ কাজের নির্দেশ দিলেই তো যথেষ্ট ছিল। জবাবে 'উমার রা. বললেন, আমার চেয়ে ও আহনাফের চেয়ে বড় গোলাম আর কে আছে? কেননা কোন ব্যক্তি যখন মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বে থাকে তার জন্যে এরূপ ভাবেই দায়িত্ব পালন করা উচিত ও ওয়াজিব, যেভাবে একজন মনিবের প্রতি গোলামের দায়িত্ব পালন করা ওয়াজিব।[৪৮] আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাদি বিল্লাহ (৪৬৭-৪৮৭ হি.)-এর মন্ত্রী আবু শুজা-এর নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল,

.قالَ لَهُ رَجُلٌ: إِلَى جَانِبِنَا أَرْمَلَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ وَهُمْ عُرَاةٌ وَجِيَاعٌ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ خَاصَّتِهِ نَفَقَةً وَكُسْوَةً وَطَعَامًا، وَنَزَعَ عَنْهُ ثِيَابَهُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهَا حَتَّى ترجع إلي بخبرهم، فذهب الرجل مسرعاً بما أرسله على يديه إليهم، ثم رجع إليه فأخبره أنهم فرحوا بذلك ودعوا للوزير، فسر بذلك ولبس ثيابه.

'আমাদের একজন বিধবা প্রতিবেশী আছেন, যার চারটি সন্তান রয়েছে। তারা নগ্ন দেহে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করে। কথাটি শোনার সাথে সাথে মন্ত্রী একজন লোক নিয়ে খাদ্য, বস্ত্র ও কিছু নগদ অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। অত:পর প্রচণ্ড শীতে নিজের দেহের পোষাক খুলে রেখে দিলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি পোষাক পরব না, যতক্ষণ না এই ব্যক্তি আমার নিকট তাদের খবর নিয়ে আসে।' লোকটি ছুটে চলে গেল এবং দায়িত্ব পালন করে ফিরে এসে বলল যে তারা খুব খুশী হয়েছে এবং মন্ত্রীর জন্য দু'আ করেছে। একথা শোনার পর মন্ত্রী পোষাক পরিধান করলেন।'[৪৯]

কি বিস্ময়কর কথা! একজন প্রজার দেহে কাপড় নেই শুনে মন্ত্রী নিজের দেহের কাপড় খুলে রেখে দিলেন। আর না আসা পর্যন্ত ঐভাবেই প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে থাকেন। এ যুগে এর কোন তুলনা আছে কী ? এটাই ছিল আল্লাহভীরু মন্ত্রীদের অন্যতম দৃষ্টান্ত। যারা ভালকরেই জানতেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত এক পা-ও নড়তে দে'য়া হবে না। যেমন এ সম্পর্কীয় হাদীসের বর্ণনা এই যে,

عن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী কারীম সা. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানগণ তার রবের নিকট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দে'য়া পর্যন্ত এক পা-ও নড়তে পারবে না। ১. কিভাবে সে তার জীবনকে অতিবাহিত করেছে? ২. তার যৌবনকে সে কিভাবে ব্যয় করেছে। ৩. কিভাবে সে তার অর্থ সম্পত্তি আয় করেছে? ৪. তার অর্জিত সম্পত্তি সে কোন পথে ব্যয় করেছে ? ৫. সে তার জ্ঞানের আলোকে কী করেছে?।'[৫০] রাসূল সা. এ সম্পর্কে আরও বলেন,

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

'মা'কাল ইবন ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ কোন বান্দাকে যদি প্রজাদের উপর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন, অতঃপর সে তাদের উপর খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন।'[৫১]

আর এ নির্দেশ শুধুমাত্র শাসকদের জন্যে নয়; বরং যে কোন দায়িত্বশীলের জন্যে একই হুকম প্রযোজ্য। তাই ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে যেমন তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে, ঠিক তেমনি পরকালীন জীবনে প্রত্যেককে কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহির সম্মুখীন করা হবে। শুধু তাই নয় কর্মের স্বপক্ষে তার শরীর থেকেই সাক্ষ্য পেশ করা হবে। যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

'সেদিন (কিয়ামতের দিন) তাদের কৃতকর্ম বিষয়ে তাদের জবান, হাত ও পা সাক্ষ্য প্রদান করবে।'[৫২] আল-কুরআনে এ বিষয়ে আরও বর্ণিত হয়েছে,

﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

'এমনকি তারা যখন এর কাছে উপনীত হবে তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন ? তারা বলবে, যে আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না এ ধারণায় বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।'[৫৩] সেদিন বয়স, যোগ্যতা ও পদমর্যাদার হিসাবে মানুষের জবাবদিহিতার তারতম্য হবে। সেদিকে লক্ষ্য করেই রাসূল সা. বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সা. এরশাদ করেছেন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার জনগণের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব তাকে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর দাস তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, কাজেই তাকে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। অতএব, তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৫৪]

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ ও নিশ্চিত করা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। ব্যক্তি জীবনে, সামাজিক জীবনে ও সরকারী কাজকর্মেও জবাবদিহিতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ কার্পণ্য করা যাবে না। কেননা জবাবদিহিতার অনুভূতি প্রত্যেক ব্যক্তি তথা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সচেতন করে তোলে। কর্মে প্রতারণা, অবহেলা ও ফাঁকিবাজির প্রবণতা থেকে বিরত রাখে। দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করলে কর্তৃপক্ষ বা সরকার তথা আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।এ ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ 'তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন কর। কেননা অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[৫৫] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ 'তোমরা যা কর, সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[৫৬] এ ব্যাপরে মহানবী সা. হাদীসে এরশাদ করেন, وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها". '(সরকারী দায়িত্ব) একটি আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে। অবশ্য সেই ব্যক্তির জন্য নয় যে এটা দায়িত্বানুভূতি সহকারে গ্রহণ করে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করে।'[৫৭]

উপসংহার

ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রক। এটি মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সেখানে অন্যায়-অবিচার, দূর্নীতি ও বৈষম্য দূরীভূত হয়ে ন্যায়নীতি, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এজন্য সমাজের সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সঠিক ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করে পদায়ন ও চাকুরীর ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা বা উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে অযোগ্য লোক নিয়োগ দে'য়া বন্ধ হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য, দক্ষ ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের সকল প্রকার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে। যাতে ঘুষ গ্রহণ, অবৈধ সম্পদ অর্জন, কর্মে অবহেলা ও ফাঁকিবাজি থেকে বিরত থাকে।

তথ্যনির্দেশ

[১] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ৩৯৩।

[২] Khalid Bin Ismail, *Islam and the Concept of Justice* (UniversitiTeknologi MARA Perlis: Centre For Thougjt and Understanding. w.d.), p.1.

[৩] *https://ndgbu.blogspot.com/2022/11/blog-post_29.html date: 22/01/25.*

[৪] Earnest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (London: Oxford University Press, 1952.),pp.89-123.

[৫] ইবন 'আবিদীন মুহাম্মদ ইবন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আজীজ আল-হানাফী, *রাদ্দুল মুহতার 'আলা আদ-দারুল মুখতার* (বৈরুত: দারুল ফিকার, ১৩৪৬ হি.), পৃ. ৩৫১ ; সায়্যিদ মুফতী আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিকহ* (ইন্ডিয়া+দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১ খৃ.), পৃ. ৪৩১-৪৩২।

[৬] আবুল কাসিম হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুফাদদাল আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, *মুফরাদাতুল কুরআন* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ২০০৫ খৃ.), পৃ. ৪০৬।

[৭] আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শারফ, *আল-মিনহাজু শারহ সাহীহ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ*, ২১শ খণ্ড (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৩৯২ হি.), পৃ. ১২।

[৮] *প্রাগুক্ত*।

[৯] 'আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবন মাস'উদ ইবন আহমাদ আল-কাসানী আল-হানাফী, *বাদা'ঈয়ে ওয়াস সানা'ঈয়ে ফী তারতিবীস শারঈয়্যাহ*, ৭ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমীয়্যাহ, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ২।

[১০] ইবন 'আবিদীন মুহাম্মদ ইবন 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আজিজ আল-হানাফী, *রদ্দুল মুহতার 'আলা আদ-দুররুল মুখতার* ১২শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকার, ১৩৮৬ হি.), পৃ. ২৬১।

[১১] মুহাম্মদ ইবন ফারায ইবন তুল্লা আল-কুরতুবী, *আকদিয়াতুল রাসূল*, (লাহোর: ইদারাতুল মা'আরিফিল ইসলামীয়্যাহ, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ২১।

[১২] আল-কুরআন, ০৫ : ৪৪।

[১৩] আল-কুরআন, ০৫ : ৪৫।

[১৪] আল-কুরআন, ০৫ : ৪৭।

[১৫] আবূ মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবন মাস'উদ ইবন মুহাম্মদ আল-ফাররা, *মা'আলিমুত তানযিল*, ২য় খণ্ড (মক্কা: দারু তাইয়েবাহ, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৬১।

[১৬] মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাযাহ, *সুনানু ইবন মাযাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকার, তা. বি.), পৃ.৮৪৯।

[১৭] মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাযাহ, *সুনানু ইবন মাযাহ*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৮।

[১৮] আল-কুরআন, ০৪ : ৫৮।

[১৯] নাসির উদ্দীন আবূল খায়ের 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার আয়-বায়যাবী, *তাফসীরুল বায়যাবী*, ১ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুস শামিলাহ,তা.বি), পৃ. ২০৫।

[২০] আল-কুরআন, ৪৯ : ০৯।

[২১] আল-কুরআন, ১৬ : ৯০।

[২২] জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর আস-সুয়ুতী ও জালাল উদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন শিহাব আল-মহাল্লী, *তাফসীরে জালালাইন* ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, তা. বি.), পৃ. ৩৫৮।

[২৩] আল-কুরআন, ০৫ : ৫০।

[২৪] আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জরীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান আন তাবিলিল কুরআন* (সউদী আরাবিয়্যাহ: আর-মাকতাবুল তা'আউনিল দাওয়া ওয়া তাবীয়াল জালীয়াত, ২০০০ খৃ.), পৃ. ১২১৫৩।

[২৫] আল-কুরআন, ১০ : ১০৯।

[২৬] আল-কুরআন, ০৫ : ৪৯।

[২৭] আল-কুরআন, ৩৮ : ২৬।

[২৮] আল-কুরআন, ০৪ : ৮৫।

[২৯] *at-tahreek.com/article-details/9677. date: 23/01/25*

[৩০] *প্রাগুক্ত।*

[৩১] আল-কুরআন, ৩৮ : ৫-৭।

[৩২] আল-কুরআন, ১৬ : ৩৬।

[৩৩] আল-কুরআন, ০৭ : ৫৯।

[৩৪] *at-tahreek.com/article-details/9677. date: 23/01/25*

[৩৫] Sir George Bernard Shaw , *The Genuine Islam,* V-1 No-8 (London: Oxford University Press, 1936), p. 19.

[৩৬] *at-tahreek.com/article-details/9677. date: 23/01/2*

[৩৭] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

[৩৮] *facebook.com/permahnk.php/istory_Ibid=43811/809720238&vlocafe=bn_IN*

[৩৯] *britannica.com/topic/accountability. date. 05/2/2025.*

[৪০] *Ibid.*

[৪১] *youtube.com/watch?v=spwW9xXa6cY. date: 06/02/2025.*

[৪২] *bn.quora.com/জবাবদিহিতা-বলতে-কী-বোঝায়। ০৬/০২/২০২৫*

[৪৩] আল-কুরআন, ৪০ : ১৯।

[৪৪] আল-কুরআন, ৯৯ : ৭-৮।

[৪৫] আল-কুরআন, ১০১ : ৮-১১।

[৪৬] আহমাদ ইবন 'আলী ইবন 'আবদিল কাদির আল-মাকরিযী, *আল-মাওয়ায়িজ, ওয়াল এ'তেবারু বি-জিকরিল খুত্বাত ওয়াল আছার*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮ হি.), পৃ. ৩৮।

[৪৭] 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল হাকাম ইবন আ'য়ান ইবন লায়ছ ইবন রা'ফে আস-মিসরি, *সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: 'আলামুল কুতুব,১৯৮৪ খৃ./১৪০৪ হি.), পৃ. ১৩৭-১৩৮।

[৪৮] ইবনুল জাওযী, *তারীখু 'উমার* (বৈরুত: 'আলামুল কুতুব, তা.বি.), পৃ ৮৯।

[৪৯] আবূল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর আল-বাসরী আদ-দিমাশকী, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১২শ খণ্ড (দেমাশ্ক: দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল ‘আরাবী, ১৯৮৮ খৃ./১৪০৮ হি.), পৃ. ১৬৬-১৬৭।

[৫০] আবূ ‘ঈসা মুহাম্মদ ইবন ‘ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারু গারবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ১৯০; হাদীস নং ২৪১৬।

[৫১] আবূল ফযল আহমাদ ইবন ‘আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন হাজার আল-‘আসকালানী, *বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম*, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: দারুল কাবাসি লিন নাশরি ওয়াত তাওযী‘উ, ২০১৪ খৃ./১৪৩৫ হি.), পৃ. ৫৪৫ ; হাদীস নং ১৪৮৯।

[৫২] আল-কুরআন, ২৪ : ২৪ ।

[৫৩] আল-কুরআন, ৪১ : ২০-২২ ।

[৫৪] আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড (দিমাশ্ক: দারু তাওকিন নাজাত, ১৪২২ হি.), পৃ. ১৫০ ; হাদীস নং ২৫৫৪।

[৫৫] আল-কুরআন, ১৭ : ৩৪।

[৫৬] আল-কুরআন, ১৬ : ৯৩।

[৫৭] ‘আলাউদ্দীন ‘আলী ইবন হিসামুদ্দীন ইবন কাযী খান আল-হিন্দী, *কানযুল ‘উম্মাল*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (মদীনা মুনাওওয়ারা: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১ খৃ./১৪০১ হি.), পৃ. ১৮ ; হাদীস নং ১৪৬৪৭।